সেবক

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের দ্বিমাসিক পত্রিকা ৮ পাতা

কলকাতা ২৯ ফাল্গুন ১৪২১ ● শনিবার ১৪ মার্চ ২০১৫ ● ২ টাকা
sebakpatrika@gmail.com

আলোর দিশারী আমাদের লাইব্রেরি

তপতী গাঙ্গুলি

'গ্রন্থাগার জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়' -- ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ গ্রন্থাগার নিয়ে পর্যালোচনার পর ইউনেস্কোর ম্যানিফেস্টোতে একথা বলা হয়েছিল।

দীর্ঘ ৬৭ বছর আগে, ১৯৪৮ সালে আমাদের প্রতিষ্ঠান গান্ধী সেবা সঙ্ঘের গ্রন্থাগারটি পথচলা শুরু করেছিল। বর্তমানে এই গ্রন্থাগারের পুস্তকের সংখ্যা প্রায় দশ হাজার। এর মধ্যে বহু মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য বইও আছে। এই গ্রন্থাগারে শিশু ও অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে সদস্য সংখ্যা আজ ৯৩৯ জন। এছাড়াও প্রতিদিন অনেক পাঠক এই গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষ ব্যবহার করেন। এই গ্রন্থাগারের পরিচালক মণ্ডলীর বিশেষ উদ্যোগে গ্রন্থাগারটির কলেবর এবং ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখানে নিয়মিত পাঠের জন্য ১৩টি পত্রিকাও নেওয়া হয়। এটি একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। এই গ্রন্থাগার থেকে প্রতিদিন বেশ কিছু বই আদান-প্রদান করা হয়।

গ্রন্থাগারের কাজ, প্রকাশিত বই তথা তথ্যকে সংরক্ষণ করে পিপাসু পাঠকের কাছে সঠিক সময়ে নির্দিষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া। বই মানব সমাজের জ্ঞান, মেধা, প্রজ্ঞাকে সংরক্ষণ করে। যার দ্বারা সমাজ ক্রমাগত উন্নতির পথে চালিত হয়। যুগে যুগে মানব জীবনে বুদ্ধিমত্তার প্রসার ঘটিয়ে সভ্যতাকে ধাপে ধাপে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে গেছে বই বা তথ্য ভান্ডার। তাই বইকে শিক্ষার সব থেকে শক্তিশালি মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

অঙ্কন: মোহনলাল মুখার্জি

প্রাচীনকালে এই জ্ঞান সংরক্ষণের জন্য মানুষ বিভিন্ন উপাদানকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করত। যেমন পোড়ামাটির কালি,শিলাখন্ড, ভূর্জপত্র,পশুর চামড়া, ধাতুর প্লেট,গাছের ছাল ইত্যাদি। গুহা চিত্র-ও এর একটি মাধ্যম ছিল। পরবর্তীকালে কাগজের আবিষ্কার ও মুদ্রণের প্রক্রিয়া মানুষের আয়ত্তে আসার পর কাগজের বই হাতে লেখা পরে ছাপা হয়। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রণ প্রক্রিয়ায় অফসেট মেসিনের ব্যবহার গ্রন্থপ্রকাশকে এক আধুনিক স্তরে পৌঁছে দিয়েছে। বর্তমানে ই-লাইব্রেরির সিস্টেমে আর্ন্তজালের মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোনো গ্রন্থাগারের তথ্য ভান্ডারের হদিশ একটি কম্পিউটারের বোতাম টিপে উৎসাহী পাঠক পেতে পারেন। সাধারণত আমরা যে গ্রন্থাগারগুলো দেখি সেগুলো বিভিন্ন ধরনের হয়। যেমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার (School library, College library, University library), গবেষণা সহায়ক গ্রন্থাগার, শিশুদের জন্য গ্রন্থাগার, লিটিল ম্যাগাজিনের গ্রন্থাগার, বিভিন্ন সংস্থার গ্রন্থাগার,পাবলিক লাইব্রেরি ইত্যাদি। গ্রন্থাগারের এই ধরণগুলো স্থির হয় গ্রন্থাগারটির পাঠক বা ব্যবহারকারীর শ্রেণী বিভাগের উপর। প্রাথমিকভাবে মানুষের পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে school library এবং children library। কারণ শিশুকাল থেকে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার এগুলিই প্রথম সোপান যা তাকে পরবর্তীকালে জ্ঞান সমুদ্রে পৌঁছে দিতে পারে। গ্রন্থাগারের বই বা তথ্যভান্ডার পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগারের কর্মীগণ। এই কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গ্রন্থ ও অন্যান্য সামগ্রী সংরক্ষণ, বিন্যাস এবং লেনদেন একান্ত জরুরি। পাঠকের অভিরুচির দিকে বিশেষ মনোনিবেশ, পাঠকের চাহিদা মত পুস্তক ক্রয়, নতুন প্রকাশিত বই সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করা, বিশেষ বিষয় বা দিনে ঐ বিষয়ে গ্রন্থ প্রদর্শনী করা,পাঠচক্র সংগঠিত করা, শিশুদের মধ্যে গল্প বলার অনুষ্ঠান ইত্যাদি ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের গ্রন্থমুখী করা যায়। সব রাষ্ট্রেই একটি জাতীয় গ্রন্থাগার থাকে। এই গ্রন্থাগারে সেই দেশে প্রকাশিত সব বই আইন অনুসারে জমা দেওয়া হয়।

বিশ্বের সর্ববৃহৎ জাতীয় গ্রন্থাগার আমেরিকার লাইব্রেরি অব কংগ্রেস। ভারতবর্ষের জাতীয় গ্রন্থাগার কলকাতার আলিপুরে অবস্থিত National Library। ১৯০৯ সালে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি ও ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিকে লর্ড কার্জন মিলিয়ে দেন। পরে ১৯৪৮ সালে এই লাইব্রেরির নাম হয় ন্যাশানাল লাইব্রেরি এবং এটি জাতীয় গ্রন্থাগার হিসাবে স্বীকৃতি পায়। বিশ্বে কোনো জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে সাধারণ পাঠককে বই বা অন্য সামগ্রী বাড়িতে দেওয়া হয় না। শুধু মাত্র আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে বই বাড়িতে দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন পাশ হয় ১৯৭৯ সালে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ১২টি সরকারি (পঃ বঃ সরকার) ২৪৭৪টি সরকার পোষিত এবং ২৪২৬টি বেসরকারি (২০০৯-এর মার্চ পর্যন্ত পরিসংখ্যান) গ্রন্থাগার আছে।

এছাড়া পঞ্চায়েত স্তরে গ্রামের মানুষের কাছে তাঁদের প্রয়োজনীয় যেমন চাষ-বাস, পশুপালন, মাছ চাষ ও সদস্য-সাক্ষরদের উপযোগী বই পৌঁছে দেওয়ার জন্য জনগ্রন্থাগার (CLIC) খোলা হয়েছে। এই গ্রন্থাগারগুলির মাধ্যমে প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষ তাঁদের পাঠস্পৃহা মেটাতে এবং স্ব স্ব কর্ম ক্ষেত্রে কুশলতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন।

বর্তমানে সরকার নিয়ন্ত্রনাধীন গ্রন্থাগারগুলিকে আন্তর্জালের আওতায় আনার কাজ শুরু হয়েছে। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে (State Central Library) গ্রন্থাগারিকদের জন্য একটি

এরপর ৭ পাতায়

এপ্রিলেই চালু হবে বর্হিবিভাগ (ওপিডি)

দ্রুত গতিতে চলছে গান্ধী সেবা সদন হাসপাতাল তৈরির কাজ

গৌতম সাহা

গান্ধী সেবা সংঘের গান্ধী সেবা সদন হাসপাতাল তৈরীর কাজ চলছে একেবারে সময় সীমা মেনে। এবছরেই গান্ধীজীর জন্মদিন ২রা অক্টোবর জনসাধারণের সেবার জন্য যাতে হাসপাতালের দরজা উন্মুক্ত করা যায় তারই প্রস্তুতি চলছে জোড় কদমে। প্রতিটি তলা মিলিয়ে মোট ৪০,০০০ স্কোয়ার ফিটের ছতলা হাসপাতাল বিল্ডিংয়ের বড় অংশের কাজ শেষ হয়েছে। দরজা, জানলা, মেঝে, ইলেকট্রিক, জল, রঙ আর তারপর হাসপাতালের আসবাব, অপারেশন থিয়েটার, প্যাথোলজিক্যাল লাবেরোটরী, এক্সরে, সিটিস্ক্যান, ডায়ালেসিস, এসবের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, এয়ার- কন্ডিশনিং, গ্যাস লাইন, আগুন নেভানোর ব্যবস্থা, এমন হাজারও কাজ এখনো বাকি। আর এগুলি সময়মত শেষ করার জন্য বেশ বড় অংকের টাকারও বন্দোবস্ত করতে হবে। তাই এখন ফুরসৎ নেওয়ার সময় নেই হাসপাতাল ম্যানেজমেন্ট কমিটির। চেয়ারম্যান সুজিত বোসের নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রযুক্তিবিদ, হাসপাতাল বিশেষজ্ঞ আর সাধারণকর্মী পরিশ্রম করে চলেছেন রাতদিন স্বেচ্ছায়।

এবার হাসপাতালটি সম্মন্ধে একটু বিষদভাবে বলা যাক।

কেমন আর কেনইবা হাসপাতাল-

অর্থনৈতিক দুর্বলতা ও প্রবল অসাম্য, বেকারী, সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা, ভেজাল আর মাত্রাতিরিক্ত ক্ষতিকর রাসায়নিকযুক্ত খাবার, অনিয়মিত আর অসংযমী জীবনযাত্রা -- এই সব কিছুর চাপে বাঙলার সাধারণ নিম্নবিত্ত আর নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষ ভগ্নস্বাস্থ্য, যেন চিররোগী। বাসে, ট্রামে, বাজারে, ট্রেনে, এমনকি বিয়েবাড়ির আনন্দ অনুষ্ঠানে বা পুজোর প্যান্ডেলে একটু কান পাতলেই শোনা যায় অসুখ, ওষুধ আর হাসপাতালে হেনস্থার গল্পো। এরই মাঝে সরকারি হাসপাতালগুলো ছাপিয়ে সারি দিয়ে বিজ্ঞাপনের চমক লাগানো ঝাঁ চকচকে করপোরেট হাসপাতাল আর পাড়ায় পাড়ায় বেসরকারী নার্সিংহোমের হাতছানি। একবার কোনক্রমে ভর্তি হলেই রোগীর সাথে সাথে সাড়া পরিবারটিও পকেট ফাঁকা করে অসুস্থ। স্বল্প আয়ের পরিবারও তাদের সাধ্যানুযায়ী হিসাব করে সংসার চালিয়ে হাসিখুশি থাকবার চেষ্টা করে, কিন্তু হঠাৎ কোন অসুখ হয়ে বেসরকারী হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে যেতে হলেই এক লহমায় সব হিসাব তচনচ। সেইজন্য শরীর খারাপ হলে কষ্টের সঙ্গে ভয়, যতক্ষণ পারা যায় ডাক্তার না দেখিয়ে পাড়ার ওষুধের দোকানের সেলসম্যান নির্ভর চিকিৎসা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত রোগীর চাপে সরকারি হাসপাতালগুলিতে পা রাখা মুশকিল। এছাড়া, একদিকে সেখানের দীর্ঘদিনের নানা অব্যবস্থা অন্যদিকে ছোটবড় ব্যবসায়িক হাস-পাতালগুলির চোখ ধাঁধানো মার্কেটিংএর বা বহু ক্ষেত্রেই নিরুপায় হয়েই বহু মানুষ চিকিৎসা করতে গিয়ে আক্ষরিক অর্থেই সর্বসান্ত হচ্ছেন। সমস্যাটি ক্রমেই বিরাট আকার ধারণ করছে। কিন্তু কি উপায়? বলতে গেলে সত্যিই কোনো সহজ উপায় নেই। তবুও চিরকাল সুস্থ সমাজে মানুষ একক বা প্রতিষ্ঠানিক ভাবে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেয়। কারুর হাতেই ভুবনের ভার নেই, কিন্তু সাধ্যমত কিছুটাতো করা যেতেই পারে!

গান্ধী সেবা সংঘ প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে সীমিত ক্ষমতা নিয়েই এলাকার সাধারণ নিম্নবিত্ত মানুষদের জন্য নিয়মিত ভাবে দাতব্য অ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ব্যবস্থা করে আসছে, আর সব সময় অনুভব করেছে যে, প্রয়োজনের তুলনায় এই স্বাস্থ্যসেবা মোটেই যথেষ্ট নয়, দরকার পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল। অতীতে বেশ কয়েকবার উদ্যোগ নিলেও তা ফলপ্রসু হয়নি নানা কারণে। কিন্তু, অবশেষে এবার সত্যি সত্যিই এরমধ্যেই হাসপাতালের ছ'তলা বিল্ডিং মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। বাকি কাজও চলছে ঝড়ের গতিতে। এ শুধু সম্ভব হচ্ছে স্থানীয় বিধায়ক ও গান্ধী সেবা সংঘের কার্যকরী কমিটির সদস্য সুজিত বোসের আন্তরিক উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায়।

কি থাকবে গান্ধী সেবা সদন হাসপাতালে?

১০০ বেডের পূর্ণাঙ্গ এই সর্বাধুনিক মানের হাসপাতালে এক তলায় থাকবে এক্স-রে, সিটি স্ক্যান, কালার ডপলার সহ ইকো কার্ডিওগ্রাম, ইউ এস জি, টিএমটি ইত্যাদি। থাকবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শের জন্য বেশ কয়েকটি চেম্বারসহ ওপিডি। আর থাকবে ইমারজেন্সি বিভাগ।

বিল্ডিংএর বাইরে হবে ওষুধের দোকান বা ফার্মেসি, ক্যাফেটেরিয়া, পার্কিং ও অন্যান্য সুবিধা।

দোতলায় হবে অত্যাধুনিক মানের ওটি কমপ্লেক্স, যেখানে থাকবে দুটি মেজর ও একটি মাইনর সার্জিক্যাল ওটি, একটি গাইনি ও একটি চোখের ওটি ও একটি লেবর রুম।

অন্য তলাগুলিতে থাকবে ষোলো বেডের আইসিইউ ও আইটিইউ, আট বেডের ডায়ালেসিস, মা ও শিশু বিভাগ, এক ও বহু শয্যার কেবিন এবং সাধারন পুরুষ ও মহিলা বিভাগ।

এছাড়া থাকবে উন্নত মানের প্যাথলজিক্যাল ল্যাব, অফিস, সেমিনার রুম ও রেকর্ড রুম। ওঠা নামার জন্য দুটি প্রমান সাইজের লিফট আর চওড়া সিঁড়ি।

এক কথায় একটা ভালো মানের হাসপাতাল বলতে যা বোঝায়। আর এ সবই হচ্ছে আমাদের সকলের জন্য।

পরিচালন ব্যবস্থা

হাসপাতালটি পরিচালিত হবে সম্পূর্ণ অলাভজনক ভাবে। প্রাথমিক বিল্ডিং, যন্ত্রপাতি ও চিকিৎসা সরঞ্জাম, সাজসজ্জা -- এই সবের জন্য খরচ হবে প্রায় এগারো কোটি টাকা। এছাড়াও প্রাথমিক পরিচালনার জন্য চাই এক কোটি টাকা। আর এর পুরোটাই সংগ্রহ করা হচ্ছে সাংসদ ও বিধায়কদের এলাকা উন্নয়ন গ্রান্ট, জনসাধারণ ও কর্পরেটে দান ও স্পনসরশিপের মাধ্যমে। কিন্তু, এই ধরনের আধুনিক হাসপাতাল চালানো ও নিয়মিতভাবে রক্ষণাবেক্ষন করা, দুটিই বেশ ব্যায়সাপেক্ষ। ওপিডি ও ভর্তি হওয়া রোগীদের চিকিৎসা বাবদ সংগৃহিত টাকা থেকে নিয়মিত খরচ চালানো হবে। কিন্তু অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হওয়ায় ডাক্তার দেখানো, পরীক্ষা নিরীক্ষা, অপারেশন আর বেড চার্জ -- সবই হবে বেসরকারি ব্যবসায়িক হাসপাতালগুলি থেকে অনেকটাই কম এবং অনেক ক্ষেত্রেই সরকার নির্ধারিত রেটের থেকেও কম। হাসপাতালটির প্রধান উদ্দেশ্যই হল রোগীদের ওপর আর্থিক চাপ যথাসম্ভব কম রেখেও সর্বাধুনিক মানের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

এই ধরনের উদ্যোগের সফলতার জন্য প্রয়োজন সেবাসমনস্ক বহু দক্ষ ও যোগ্য চিকিৎসক, সুপ্রশিক্ষিত কর্মীবাহিনী ও যথেষ্ট সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবী। চাই অর্থ। চাই সমাজের সর্বস্তরের মানুষজনের সমর্থন ও সাহায্য ও দান।

হাসপাতালের আউটডোর (ওপিডি) চালু হবে এপ্রিলেই -

হাসপাতাল বিল্ডিং চালু হওয়ার আগেই ছোট করে হলেও দাঁত, চোখ, মেডিসিন, স্কিন, গাইনি ইত্যাদি বিশেষ' বিভাগ ও সাধারন সহ গান্ধী সেবা সদন হাসপাতালের ওপিডি চালু হচ্ছে গান্ধী সেবা সংঘের বাড়ীর একতলায়, এই এপ্রিল মাসে। এর জন্য পুরোপুরি প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। ক্যানসার গবেষক ও চিকিৎসক ডক্টর অসীম চ্যাটার্জী দাঁতের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় একটি আধুনিক ডেন্টাল চেয়ার দান করেছেন।

স্বাভাবিক ভাবেই এখানে রোগী দেখানোর ফিস হবে বেসরকারী হাসপাতাল ও অন্যান্য জায়গা থেকে অনেক কম এবং সাধারন মানুষের আয়ত্তের মধ্যে। নতুন হাসপাতাল বিল্ডিংএ নিজস্ব ল্যাবরেটরী চালু না হওয়া অবধি আপাতত স্থানীয় প্রতিষ্ঠিত ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে বিশেষ ছাড় সহ পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। আউটডোরটির সাফল্যের ব্যাপারে সকলের সমর্থন ও সাহায্য প্রয়োজন।

উল্লেখ করা যেতে পারে, গান্ধী সেবা সংঘের বর্ত্তমান দাতব্য স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রটি এখনকার মতই চালু থাকবে।

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের শিশুবিকাশ কেন্দ্র

প্রতি রবিবার সকাল দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত অতি যত্নসহকারে আঁকা শেখানো হয়। ভর্তি চলছে।

কবিগুরুর নাটককে সাধারণের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন-শিশিরকুমার ভাদুরি

ডঃ শম্ভুনাথ চক্রবর্তী

সময়ের প্রবাহে পঞ্চাশ বছরের জন্মদিনে পদার্পণ করেছে '২৫-শে বৈশাখ'। স্বভাবত তারুণ্যের তরুচ্ছায়ায় যৌবন-জলতরঙ্গকে সামাল দেওয়া কঠিন। '২৫-শে বৈশাখ' বারবার সৃষ্টিসুখের উল্লাসে নবীন-নন্দিনীদের ডাক দেয়। এই ডাকে সারা দিলেন শিশির কুমার। তাঁর নেতৃত্বে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের সভ্যরা রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুন্ঠের খাতা' মঞ্চস্থ করেছিল। কেদারের ভূমিকায় ছিলেন শিশিরকুমার। অভিনয় দেখে নট-নাট্যকার ও রসিক-কবিঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রসাপ্লুত হয়ে এবিষয়ে তাঁর স্নেহের অমল হোমকে পত্রপাঠ জানালেন ''বৈকুন্ঠের খাতার এমন সুনিপুণ অভিনয় এক আমাদের বাড়ির গগন-অবনদের ছাড়া আর কারুর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কেদার আমার ঈর্ষার পাত্র।''

ঘটনাটি ছিল চৈত্রের খরামাটির উপরে ভাবীকালের জলদ-মেঘের গভীর আস্তরণ। কিংবা গঙ্গাকে মর্তে আনার ভগীরথ-সাধনার মাঙ্গলিক বোধন।

অধ্যাপনার পেশাগত নিশ্চয়তাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে শিশিরকুমার নটরাজকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। দায়িত্ব নিলেন পেশাদারি মঞ্চের। নাটকের বীজমন্ত্র জপ করলেন সাধকের প্রাণায়ামে। জোড়াসাঁকোর সাধন-পীঠে প্রার্থনা জানালেন 'চরণ ধরিতে দিও গো আমারে...।' তারপরের ঘটনা স্রোতে জেগে উঠল নাটক-নাট্যশালা ও নাট্যপ্রযোজনার বহু বিচিত্রবর্ণের আলোকমালা। নাট্যমন্দির ও নবনাট্যমন্দির থেকে আর্ট থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথ ও শিশির ভাদুড়ির অমিয় বেণীসঙ্গম।

১৯২৫ সালের ২৬শে জুন, নাট্যমন্দিরে মঞ্চস্থ হল রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন'। 'রঘুপতির' ভূমিকায় শিশিরকুমার। তিল তিল করে তিলোত্তমা সৃষ্টির ইতিহাসের পথ চলা হল শুরু। উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালের মধ্যে, আর কোনও সাধারণ রঙ্গালয়ে 'বিসর্জন' প্রযোজিত হয়নি। শিশিরকুমারের অভিনয় দেখে রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন।

শিশিরকুমারের আবেদনকে সম্মান জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ, 'গোড়ায় গলদ' নাটকটিকে নতুন রূপে গড়ে তুললেন। নাম হল 'শেষরক্ষা'। এই নতুন নামকরণের বিষয়ে শিশিরকুমার স্মিতহাস্যে নিবেদন করলেন ''গুরুদেব দর্শক আনার পক্ষে 'গোড়ায় গলদ' নামটি বেশ ছিল।'' ২৮শে ভাদ্র ১৪-ই সেপ্টেম্বর নাট্যমন্দিরে 'শেষরক্ষা'র প্রযোজনা শুধুমাত্র শেষ রক্ষা করতেই পারেনি,

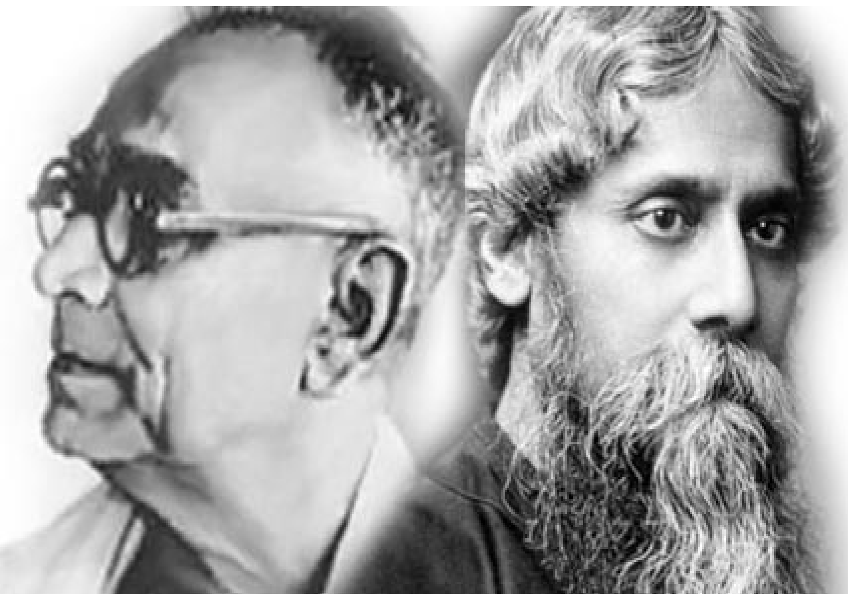

শেষের পরেও যে অশেষ আছে, সেই রসামৃত বহন করে এনেছিল। 'শেষরক্ষা'য় 'চন্দ্রবাবু'র চরিত্রে শিশিরকুমারের অবিস্মরণীয় সৃজনশীলতার পরিচয় পেয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রীত হয়ে বলেছিলেন ''শিশিরকুমার লক্ষ্মী জয় করেছে।''

চলার আনন্দবেগে শিশিরকুমার চলতে লাগলেন সেতারের দ্রুত তালের গতের মতো। ১৯২৯-এর ২৫শে ডিসেম্বর, নাট্যমন্দিরে প্রযোজিত হল 'তপতী'। উল্লেখ্য, যে ঐ বছরই ২৬, ২৭, ২৮ ও ২৯শে সেপ্টেম্বর জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে একটানা চারদিন সন্ধ্যাবেলা 'তপতী'র অভিনয় হয়। রবীন্দ্রনাথ জলন্ধর রাজ বিক্রমদেবের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। এরপরই শিশিরকুমারের 'তপতী' নাট্য প্রযোজনা। নাট্যজগতে অপরিসীম কৌতূহল আর উত্তেজনা। শিশিরকুমারের প্রযোজনায় 'তপতী'র সাফল্য বিষয়ে 'নাচঘর' লিখল ''ঠাকুরবাড়ির গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ সহ অনেকে এসে সে অভিনয় দেখলেন। অবনীন্দ্রনাথ বললেন, 'রবিকাকা'র অভিনয়ের চেয়ে কোনও অংশে খাটো নয়।'' এই নাট্য প্রযোজনার পরিণামটি সুখের হয়নি। দর্শকের অভাবে নাট্যমন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। এর অন্যতম কারণ - রবীন্দ্রনাথের নাটকের মর্মগ্রহণ করার মতন শিক্ষার উৎকর্ষ ও রসবোধ তখন দর্শক সাধারণের ছিল না। তবুও রবীন্দ্র-নাটককে ধরে রাখা ও ছড়িয়ে দেবার কাজে শিশিরকুমার ছিলেন চলিষ্ণু।

অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে আর্ট থিয়েটারে যোগ দেওয়ার পর শিশিরকুমার 'চিরকুমার সভা'র নাট্যাভিনয়ে 'চন্দ্রবাবু'র চরিত্রে অভিনয় করেন। শেষ দৃশ্য পরার পরেই অবনীন্দ্রনাথ বাঁধভাঙা আনন্দে শিশিরকুমারকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। স্মরণযোগ্য যে শিশিরকুমারের জন্যই রবীন্দ্রনাথ 'প্রজাপতির নির্বন্ধ'কে পরিবর্তিত করে 'চিরকুমার সভা' রচনা করেন।

শিশিরকুমারের বিনম্র আবেদনের ওজনস্তরের প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর আস্থা ছিল। 'যোগাযোগ' উপন্যাসটিকে তিনি নাট্যরূপ দিয়ে সেটির প্রযোজনার ভার শিশিরকুমারের ওপর অর্পণ করেন। ১৯৩৬ সালে শিশিরকুমার নবনাট্যমন্দিরে যোগাযোগ মঞ্চস্থ করেন। প্রযোজনা দেখতে গিয়ে কবিঠাকুর শেষ পর্যন্ত না দেখে আসন ত্যাগ করতে পারেননি। স্নেহের চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে কবিঠাকুর পত্র মারফত জানালেন, ''নবনাট্যমন্দিরে 'যোগাযোগ' দেখতে আমন্ত্রিত হয়ে মনে কুণ্ঠা নিয়ে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে মনে আনন্দ ও বিস্ময় নিয়ে ফিরে এসেছি। এমন সুসমপন্ন অভিনয় সর্বদা দেখা যায় না।''

রবীন্দ্রনাথের নাটককে সাধারণ রঙ্গালয়ে মঞ্চস্থ করে শিশিরকুমার চেয়েছিলেন নাট্যজগতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাট্যদর্শন ও চিন্তাধারার সেতুবন্ধ করতে। তিনি উপলব্ধি করেন যে, জাতীয় জীবনের সার্বিক সাংস্কৃতিক, বিশেষত নাট্য-সংস্কৃতির মানোন্নয়নের জন্য বাংলার জাতীয় রঙ্গমঞ্চের বিশেষ প্রয়োজন ছিল রবীন্দ্রনাথের মত নাট্যকারের।

নানান কারণে বাংলা থিয়েটার দেখা ও বাংলা পেশাদারি থিয়েটার সম্পর্কে কবির অনীহা ও ধারণার পরিবর্তনও তিনি করতে চেয়েছিলেন। সাধারণ রঙ্গালয়ে শিশিরকুমারের অভিনয় ব্যতীত আর কোনও অভিনয় দেখতে যাননি রবীন্দ্রনাথ। অকপটে জানিয়েছেন, 'শিশির ভাদুড়ির প্রয়োগ-নৈপুণ্য সম্বন্ধে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে।' বলেছেন, 'শিশিরকে আমি ক্ষমতাশালী লোক বলেই জানি।' রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুগ্রহে শিশিরকুমার তাঁর নতুন নাটক 'রক্তকরবী'র অভিনয় করার অধিকার পেয়েছেন। এ যেন শিব কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের রমণ।

মেঘ বোঝে মাটির ব্যথা, তাই সে মাটিতে ঝরে। নদী বোঝে সাগর কোথা, তাই সে ছোটে। শিকড় জানে রসের দিশা, তাই সে গভীরে লুটায়। নটরাজ শিশিরকুমারের নাট্য চেতনায় ছিল 'জাতীয় রঙ্গালয় ও রবীন্দ্রনাথ'। যৌব শক্তির অঙ্কুরোদ্গম থেকে জীবনের মোহনা পর্যন্ত তিনি অভিসারে চলেছেন রবীন্দ্রনাট্য-রতিকে একমাত্র পাথেয় করে।

শিশিরকুমারের বীক্ষায় এই প্রত্যয় ছিল 'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপন হলে আমরা পেতাম অপূর্ব সমৃদ্ধ নাট্যসাহিত্য, জাতীয় বৈশিষ্টসম্পন্ন নাট্য-শালা...।' আজ একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এসে ইথার তরঙ্গে ভেসে আসে শিশিরকুমারের গভীর আক্ষেপ 'দেখ, বিদেশিরা যখন আমার অভিনয় দেখে প্রশংসা করে...তখন এতটুকু খুশি হইনে। ... তারা ভুলে যায় এটা রবীন্দ্রনাথের দেশ।'

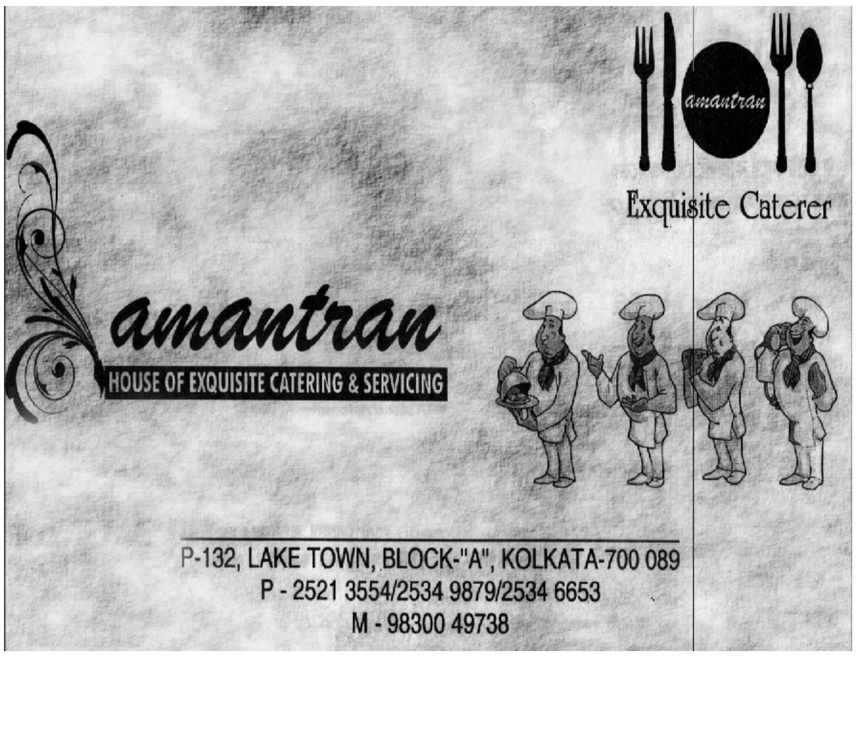

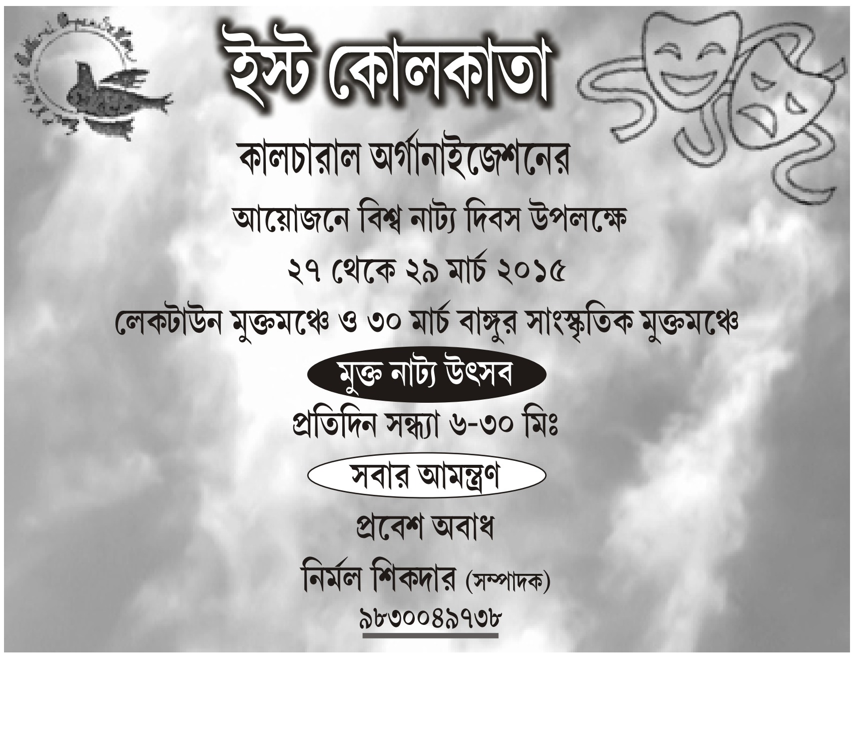

সেবক
কলকাতা ২৯ ফাল্গুন ১৪২১ • শনিবার ১৪ মার্চ ২০১৫

বসন্তের এই মাতাল সমীরণে...

ফুৎকারেই চলে যায় আমাদের ঋতুগুলো! ব্রিটেনে বসন্ত বিরাজ করে মার্চের শেষ থেকে জুনের শেষার্দ্ধো পর্যন্ত। বাংলাদেশে ফাল্গুন ও চৈত্র এই দুই মাসই খানিকটা হলেও উপলব্ধি করা যায় বসন্তের মেজাজকে। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত এবং বসন্ত -- এই ছয় ঋতুর আবর্তে 'বসন্ত'ই সবচেয়ে প্রিয়। মনের দিক থেকে। মেজাজের গভীরে। নিজেকে, নিজের চেনা পরিসরকে ঘষে-মেজে ঝকঝকে করার সময়ই তো 'বসন্ত'! বসন্তকাল। শীতের শেষ থেকে ঝরতে থাকা রং-বেরঙের ফুল-পাতা -- এ তো প্রকৃতিরই নিয়ম। ...সে যেন লাল কার্পেটে মোড়া! ঝরে যাওয়া শিমুল পলাশের রং। নানান রঙে নিজের সাথে সাথে অপরকে রাঙিয়ে তোলারই সময়। সম্রাট আকবরও হিন্দু নারীদের নিয়ে বসন্তের রঙে মেতেছিলেন। আর শ্রীকৃষ্ণ! যখন সে বৃন্দাবনে তখনও রং, যখন মথুরায় তখনও রং, আর যখন মহাভারতে, তখনও রঙিন। কৃষ্ণের তিন রূপের সঙ্গেই নীবিড়ভাবে জড়িত বসন্ত, মানে রঙের। আর, আমাদের এই পত্রিকা 'সেবক', সে ধরে রেখেছে তার রং। শান্তির রং, সেবার রং, মিলনের রং। আসলে রঙিন। বসন্তের রং।

স্মরণে

মায়া রায়

স্বর্গীয় শরদিন্দু রায়ের স্ত্রী মায়া রায় প্রয়াত হয়েছিলেন ৭ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৫। রেঙ্গুন, অধুনা মায়ানমারে তিনি জন্মেছিলেন ১৯৩৬ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন রেঙ্গুন থেকে একটি জাহাজে তাঁর প্রিয় পুতুলের বাক্সটি নিয়ে চলে আসেন অবিভক্ত ভারতের উত্তরবঙ্গে। সঙ্গে ছিলেন মা, দুই বোন ও তিন ভাই। তখন তিনি মাত্র ৯ বছরের বালিকা। অতি অল্প বয়সেই তিনি হারান তাঁর মা-বাবাকে। ফলত শৈশব কাটে নিদারুণ কষ্টের মধ্যে দিয়ে। এরপর কলকাতায়। কলকাতা ইউনিভার্সিটি থেকে বাংলায় এমএ পাস করেন। লেখালেখির অভ্যাস অতি ছোটবেলা থেকেই। পরবর্তীতে বই আকারে প্রকাশ করেন শোভনদীপ, বর-রাজা, জয়তু-বাত্রা এবং শেষ কবিতার বই আতস কাচ। তিনি রেখে গেলেন দুই ভাই, তুষার ঘোষ ও শিশির ঘোষ এবং দুই প্রিয় কন্যা শ্রাবন্তী পালরায় ও সাবেরি রায়কে। তাঁর নীবিড় সংপৃক্তি ছিল গান্ধী সেবা সঙ্ঘের সঙ্গে। এই সেবা সঙ্ঘের লাইব্রেরি গঠনে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। মায়া রায়ের স্মৃতি এই সঙ্ঘে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে জানিয়ে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করে গান্ধী সেবা সঙ্ঘের প্রতিটি সদস্য।

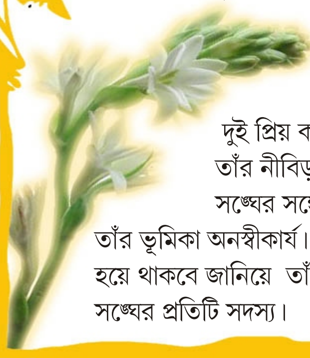

MAHALAYA
SNACKS CORNER

RESTAURANT & CATERING
Free Home Delivery
P-703, Lake Town, Block - 'A', Kolkata-700 089
Phone: 033-2521 3049
M– 09433603431

কোর ব্যাঙ্কিং সলিউশন

শংকরলাল ঘোষাল

ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের উৎকর্ষতা নির্ভর করে দ্রুত পরিবর্তনশীল বাজার ব্যবস্থায় গ্রাহকের চাহিদার প্রয়োজনকে মাথায় রেখে নিজের পরিষেবা কতটা পরিবর্তন করতে পেরেছে তার উপর। আধুনিক দুনিয়ায় পরিষেবা ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত চাহিদার বৃদ্ধি ঘটছে। সময়ের সাথে সাথে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা ক্ষেত্রে গ্রাহকের চাহিদারও উওরোওর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর সেই কারণে ব্যাঙ্কিং শিল্প আধুনিক টেকনোলজি আমদানি করে সামগ্রিক পরিষেবার ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি ঘটিয়েছে। যা তার পরিচালন পর্ষদের মাধ্যমে সঠিক পরিচালন ব্যাবস্থায় উন্নততর দুনিয়ার সাথেপাল্লা দিচ্ছে। এই আধুনিক ব্যাবস্থাটিই হল সিবিএস সিস্টেম মানে কোর ব্যাঙ্কিং সলুউশন। এই প্রক্রিয়া এমনই একটি আধুনিক স্বয়ংক্রিয় ব্যাবস্থা যাতে গ্রাহক নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কের যে কোনও শাখা থেকে পরিষেবা গ্রহণ করতে পারেন। তিনি ব্যাঙ্কের কোন্ শাখায় অ্যাকাউন্ট বা খাতা খুলেছেন তা মাথায় না রেখেই। এই ব্যাবস্থায় গ্রাহক কোনও একটি নির্দিষ্ট শাখার গ্রাহক নন অথচ তিনি পরিণত হলেন সেই ব্যাঙ্কের গ্রাহক হিসাবে।

এই ইন্টারনেট ব্যাবস্থার মাধ্যমে সূচণা হল যেকোনও স্থানে যেকোনও সময়ে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা নেওয়ার। এই আধুনিক ব্যাবস্থায় গ্রাহকের যে তথ্যভান্ডার ব্যাঙ্কের অধিকারে এল এবং তার পরিষেবার উপর নজর রেখে আগামী দিনে আরও ভাল ও তার সম্পূর্ণ সন্তুষ্টি প্রদান করার সুযোগও এসে গেল। বর্তমানে গ্রাহক ইন্টারনেট পরিষেবার মাধ্যমে এই সিবিএস ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় এক অসাধারণ ব্যাঙ্কিং অভিজ্ঞতার মুখোমুখি।

ব্যাঙ্কের যেকোন একটি সিবিএস শাখা যেন প্রকৃত অর্থেই বিক্রয় ও পরিষেবা ক্ষেত্রের যৌথ বর্হিবিভাগ। অন্যান্য অন্তর্বিভাগ পরিষেবা স্বয়ংক্রিয় ও নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থার মাধ্যমে অন্য কোনও নির্দিষ্ট জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়। যাকে ব্যাক- অফিস বা ডাটা সেন্টার বলে। আর এ কারণেই সিবিএস শাখায় আধিকারিক বা কর্মীবর্গ গ্রাহকের সাথে আলোচনা বা অন্যান্য সুবিধা প্রদানে অনেক সময় পান। এতে শাখা বা সামগ্রিকভাবে ব্যাঙ্কের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং গ্রাহক ও কর্মীবর্গের মধ্যে একটি সুস্থ সম্পর্কের বা সুখি পরিবেশের বাতাবরণ তৈরি করে।

বর্তমানে এই সিবিএস সিস্টেমের মাধ্যমে গ্রাহক কি কি পরিষেবা পাচ্ছেন বা পেতে পারেন যে কোন ব্যাঙ্কের যেকোন শাখা থেকে তার একটি তালিকা দেওয়া যাক।

১। এই ব্যবস্থায় ব্যাঙ্কের খাতায় জমা-খরচের তথ্য যে কোন নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কের যেকোনও শাখা থেকে পাওয়া যাবে।

২। নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কের যেকোনও শাখা থেকে চেকের মাধ্যমে টাকা তোলা যাবে।

৩। ব্যাঙ্কের যেকোনও শাখায় তার নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে টাকা জমা করা যাবে।

৪। চেক ক্লিয়ারিং ব্যবস্থায় যেকোনও শাখায় চেক জমা করা যাবে।

৫। নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা অন্য কোনও ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে যে কোনও শাখা থেকে চেক বা নগদ জমা করা যাবে।

৬। সিবিএস সিস্টেমে NEFT বা RTGS ব্যবস্থার মাধ্যমে অতি দ্রুত যে কোনও ব্যাঙ্কে যে কোনও ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে টাকা প্রেরণ করা যায়।

৭। নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থায় অন লাইনে টাকা মেটাবার সুবিধা থাকায় যে কোনও শাখা থেকে ডিমান্ড ড্রাফট বা ব্যাঙ্কার্স চেক তৈরি করে নেওয়া যায়।

৮। সিবিএস ব্যবস্থার মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং, মোবাইল ব্যাঙ্কিং, এটিএম-এর ব্যবহার সহ যে কোনও ধরনের বিল পেমেন্টের সুবিধা পাওয়া যায়।

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের সেবা নিবাস - তিন তলায় নতুন ঘর

কলকাতার বাইরে থেকে চিকিৎসার জন্য আসা ক্যান্সার রোগী ও তাঁদের সঙ্গীদের স্বল্প খরচে থাকবার জন্য এখন সেবা নিবাসে মাত্র চোদ্দটি ঘর আছে। সংখ্যাটি চাহিদার তুলনায় অতি সামান্য। ঘরের সংখ্যা আরও কিছু বাড়ানোর জন্য বেশ কিছুদিন যাবত চেষ্টা চলছে। আনন্দের কথা, এই মুহূর্তে সঙ্ঘের তিনতলায় এগারোটি নতুন ঘর তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। গত ২৬ জানুয়ারি ছাদের ঢালাই হওয়ার পর এখন ইঁট গাঁথার কাজ চলছে পুরোদমে। তবে, শুধু ঘর তৈরিই নয়, থাকবার জন্য আসবাবপত্র, জল-আলো-পাখা - এমন অনেক কিছুরই ব্যবস্থা করতে হবে। চেষ্টা চলছে যাতে এই নববর্ষের প্রারম্ভেই এই ঘরগুলো রোগীদের থাকবার জন্য ব্যবহারযোগ্য করে তোলা যায়।
এখানে বলা দরকার, এই সব কিছুই সম্ভব হচ্ছে শুভানুধ্যায়ীদের দান ও সাহায্যে। সর্বোচ্চ পৌনে দু'লক্ষ টাকা থেকে এক হাজার টাকা - এমনভাবে এ পর্যন্ত প্রায় ছয় লক্ষ টাকা আমরা স্বেচ্ছাদান হিসেবে পেয়েছি। কাজ সম্পূর্ণ করতে আরও প্রায় দু'লক্ষ টাকা দরকার। এই সময়ের মধ্যেই প্রয়োজনীয় টাকা দানের মাধ্যমে সংগৃহীত হবে বলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। সবাই নিশ্চয়ই জানেন যে, গান্ধী সেবা সঙ্ঘকে দেওয়া সমস্ত দান ৮০জি ধারায় আয়কর মুক্ত।

সামুদ্রিক চিকেন – 'কোবিয়া'

ধনঞ্জয় আঢ্য

বাঙালি মানেই মাছে-ভাতে। যতই ডাক্তারি নিষেধাজ্ঞা বর্তাক না কেন, বিশেষত বাঙালির পাতে রেড মিটের পরিমাণ তুলনায় ইদানিং কমলেও, তার পরিবর্ত হিসেবে ব্রয়লার চিকেন মানে মুরগির মাংসের চল নিত্যদিন কিন্তু বেড়েই চলেছে। এরই পাশাপাশি খাদ্য-তালিকায় প্রোটিনের প্রয়োজনে মাছের অবদান অনস্বীকার্য। ভারতের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকের বেশি মানুষ তাঁদের খাদ্য তালিকায় নিয়মিত কোনও না কোনও মাছ রাখবেনই।

এই প্রসঙ্গে আজকে এমনই একটি মাছের কথা বলব যাকে সী-চিকেনও বলা হয়।

১০-১৫ বছর আগেও ততোটা পরিচিত নাম ছিল না এই Black King Fish-এর। এই বিশেষ মাছটির দুর্দান্ত স্বাদের কারণে বর্তমানে এটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অতীব জনপ্রিয়। আজকের দিনে আমাদের দেশের দক্ষিণাঞ্চলের এটি একটি উল্লেখযোগ্য মাছ। তামিল ভাষায় এই মাছটিকে বলা হয় 'কুরাঙ্গ মীন'। মূল 'কোবিয়া' (COBIA) নামে এই মাছটির বৈজ্ঞানিক নাম Rachycentron Canadum।

ভিয়েতনামে সমুদ্রের শান্ত পরিবেশে এই মাছটি খাঁচায় ভরে চাষ করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশে সমুদ্রের অশান্ত-উত্তাল ঢেউয়ের কারণে খাঁচায় ভরে সমুদ্রে চাষ করা তুলনায় অসুবিধাজনক। যদিও এই অসুবিধা দূর করতে বিজ্ঞানীরা নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের ভাবনা নিয়েছেন। চেন্নাই-এর সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ ব্রাকিশওয়াটার অ্যাকোয়াকালচার (CIBA) এই মাছটির প্রণোদিত প্রজনন (Induced breeding)-এ আজ সক্ষম হয়েছে। লবণাক্ত ও ইষৎ-লবণাক্ত জলে 'কোবিয়া' মাছ খাঁচায় ভরে পালন-পুকুরেও চাষ করা যায়। সাধারণত, মাছ চাষীরা যেখানে ভেটকি মাছের ১০০০টা বাচ্চা থেকে এক বছরে এক টন বড় মাছ উৎপাদন করতে পারেন সেক্ষেত্রে 'কোবিয়া'র মাত্র ১০০টি মাছের বাচ্চা থেকে ওই সমপরিমাণ মাছ পাওয়া যায়। 'কোবিয়া'র বৃদ্ধি-গতি অতি দ্রুত হওয়ায় দেখা যাচ্ছে প্রতি বছরে এর ওজন ১০ কেজি পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে।

পরীক্ষামূলক খামারে স্ত্রী মাছ ও পুরুষ মাছকে যথাক্রমে ১:২ অনুপাতে রেখে প্রণোদিত প্রজনন করানো হচ্ছে। ডিম্বাণু নিঃসরণ ত্বরান্বিত করার জন্য স্ত্রী মাছকে হর্মোন ইঞ্জেকশনও দেওয়া হয়। প্রতিটি প্রজননের সময় এক-একটি স্ত্রী মাছ কয়েক লক্ষ ডিম ছাড়ে এবং পুরুষ মাছ ওই ডিম বহিঃনিষিক্ত করে। ২০ থেকে ২২ ঘণ্টা পরে নিষিক্ত ডিম থেকে ডিম-পোনা বেরিয়ে আসে। তারপর ওই বাচ্চাগুলি ১০সেমি লম্বা হলেই সেগুলিকে পালন-পুকুরে ছাড়া হয় অথবা খাঁচায় ভরে সমুদ্রের আপেক্ষিক শান্ত অঞ্চলে চাষ করা হয়।

স্বাদ ও মাছের পরিমাণের কারণে দেশের বাজারে ইদানিং এটির ভাল দামও পাওয়া যাচ্ছে। দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু ও কেরালার বাজারে বর্তমানে এর দাম ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকা প্রতি কেজি।

আমাদের রাজ্যের সুন্দরবন অঞ্চলে যেখানে প্রায়ই জোয়ার বা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাঁধ ভেঙে জমিতে লবণাক্ত জল ঢুকে পরে স্বাভাবিক চাষের প্রতিকূল পরিস্থিতি হয়ে দাঁড়ায়, সেখানে ওই লবণাক্ত জলকে ব্যবহার করে 'কোবিয়া' চাষের ভাল সুযোগ রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

রাজ্যে মাছের চাহিদার তুলনায় যোগানের অপ্রতুলতার কারণেই আজও দক্ষিণের মাছ-বাজারের দিকে আমাদের তাকিয়ে থাকতে হয়। এক্ষেত্রে এই 'কোবিয়া' মাছ চাষের উপযুক্ত বন্দোবস্ত করতে পারলে আমাদের রাজ্যের বাজারে মাছের যোগান অনেকটাই বাড়িয়ে তোলা যায়। প্রান্তিক বা বাঁদা অঞ্চলের মানুষের জীবিকা নির্বাহের খানিকটা সুরাহাও এতে করে হতে পারে যেমন, তেমনি বিদেশে রপ্তানি করে বিদেশি মুদ্রা আয়েরও একটা পরিসর গড়ে তোলা যেতে পারে। অপেক্ষা, রাজ্যের মৎস্য দপ্তর আগামীদিনে এব্যাপারে সত্যিই কতটা উদ্যোগী হয়! তথ্যসূত্র: অ্যাকোয়া ইন্টারন্যাশনাল

মোদি সুট

দীপা দত্ত

ঘন নীল বন্ধগলা! আসলে নামাবলি। যিনি পরেছেন, স্বয়ং তাঁরই নামের উল্কি সর্বাঙ্গে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সঙ্গে হায়দরাবাদ হাউসে চায়ে পে চর্চায় সারা গায়ে নিজের নামের মোনোগ্রাম করা ওই বন্ধ গলাতে সেজেছিলেন প্রধান-মন্ত্রী। নিজের নাম লেখা পোশাক পরার নজির ছিল মিশরের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট হোসনি মুবারকের। মোদির এই লাটসাহেবি, বাড়াবাড়ি রকমের আত্মশ্লাঘায় শুধু বিস্তর সমালোচনাই হয়নি, দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি-র শোচনীয় হারের অন্যতম কারণ অসংখ্যবার 'নরেন্দ্র দামোদারদাস মোদি' লেখা ওই দশলাখি পোশাক বলে অনেকেরই ধারণা। সেই সুটকে নির্বাচনী ইস্যু করে ফেলেছিলেন বিরোধীরা। আর দিল্লিওয়ালাদের সম্ভবত মনে হয়েছিল, যে প্রধানমন্ত্রী নিজেতে নিজে এমন মশগুল, তিনি মানুষের জন্য কী করবেন! খবর হল, গলার ফাঁসে পরিণত হওয়া ওই বন্ধগলাকে এবার পাকাপাকিভাবে বিদায় দিচ্ছেন মোদি। সুরাটে আজ নিলামে উঠল সেই পোশাক। দর উঠেছে ১.১১ কোটি টাকা। হেঁকেছেন রাজেশ জুনেজা। অনাবাসী ভারতীয় শিল্পোদ্যোগী মোদিভক্ত বিরল চৌকসি মোদিকে না পেয়ে তাঁর 'পোষাক'কে সঙ্গে রাখতে চান। তার জন্য সুট কিনতে চেয়ে প্রথমে দর হেঁকেছেন ১.১১ কোটি টাকা। নিলামের আরও দু'দিন বাকি। সুতরাং দর আরও বাড়তেই পারে।

সুরাটের এক চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যাট পঙ্কজ প্রথম দর দেন ১১ লাখ টাকা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ৫১ লক্ষ টাকা হাঁকেন এস্টেট ডিলার রাজু আগরওয়াল। প্রধানমন্ত্রী গঙ্গা পরিচ্ছন্ন রাখার মত এক মহৎ উদ্দেশ্যে টাকা তোলার জন্য তাঁর সুট দিয়েছেন। সেই সৎ কাজে শরিক হতেই দ্বিগুণ দর চড়িয়ে কোটি টাকায় কিনতে চান গুজরাটের ব্যবসায়ী সুরেশ আগরওয়াল। এর পর দাম বাড়তে বাড়তে আজ দিনের শেষে ১.২১ কোটিতে গিয়ে ঠেকেছে। এদিকে এই বন্ধগলা সুট-বিতর্কে নতুন মাত্রা পেল অনাবাসী গুজরাটি ব্যবসায়ী রমেশ বি বিরানির মন্তব্যে। জানালেন, 'সুটটির অমন দাম নয়। ছেলের বিয়েতে নিমন্ত্রণ করার সময় তিনি মোদিকে এটি উপহার দিয়েছিলেন। তখনই মোদি তাঁকে জানিয়েছিলেন, সামনে প্রচুর কাজ এবং এই সুটটি তিনি দান করে দেবেন। রমেশ মোদিকে জানান, তিনি সুটটি পরে বিয়েতে এলে সেটাই হবে তাঁর ছেলেকে সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ।'

দশলাখি ওই বন্ধগলা তৈরি করেছে আমেদাবাদের 'জেড ব্লু' সংস্থা। আগমার্কা 'মোদি কুর্তা' তারাই বানায়। ওই বন্ধগলা সুট ছাড়া আজ নিলামে উঠেছে আরও ৪৫৫টি জিনিস, যার অধিকাংশই সোনা, রুপো, তামা ও পেতলের তৈরি, যা প্রধানমন্ত্রী হওয়া ইস্তক উপহার পেয়েছেন মোদি। তিনদিনব্যাপী নিলামের শেষে প্রাপ্ত অর্থের সবটাই যাবে 'গঙ্গা শোধন মিশন'-এর ভাঁড়ারে। জানিয়েছেন সুরাট পুরসভার চেয়ারম্যান মিলিন্দ তোরাভানে। নিলামের আসরটি বসেছে সুরাট পুরসভার সায়েন্স কনভেনশন সেন্টারে। উল্লেখ্য, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীনই এমন উদ্যোগ নিয়েছিলেন মোদি। সেই সময় পাওয়া সমস্ত উপহার নিলামে বিকিয়ে সেখান থেকে প্রাপ্ত অর্থের সবটাই লাগিয়েছিলেন গুজরাট সরকারের 'কন্যা কেলাভানি যোজনা'য়। মেয়েদের শিক্ষার প্রসারে সেই কর্মসূচি চালু করেছিলেন মোদিই। বন্ধগলা এবং অন্য সামগ্রী বিক্রি থেকে আসা প্রাপ্ত অর্থ গঙ্গা শোধনে কাজে লাগানোকে অবশ্য 'ড্যামেজ কন্ট্রোল' হিসেবে দেখছেন কংগ্রেস নেতা অজয় মাকেন। প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, ওই মহার্ঘ সুট নিয়ে যা নিন্দামন্দ শুনতে হয়েছে, তা চাপা দিতেই প্রধানমন্ত্রীর এই উদ্যোগ। সুরাট সিটি কালেক্টর রাজেন্দ্র কুমার জানিয়েছেন, ২০ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৫টায় শেষ হবে নিলাম।

পরের দিন বাড়তে বাড়তে শেষ পর্যন্ত দর উঠল ৪.৩১ কোটি টাকায় ওই মোদি সুট। প্রধানমন্ত্রীর দশলাখি বন্ধগলা সুটের নতুন মালিক সুরাটের 'ধর্মানন্দ ডায়মন্ডস'-এর মালিক হীরের কারবারি হিতেশ লালজিভাই প্যাটেল। তাঁর সঙ্গে দরে এঁটে উঠতে পারেননি কেউই। এদিকে দরদাতাদের কম করেও দুজন আয়কর হানার মুখে পড়েছিলেন, এমন অভিযোগ উঠেছে। হিতেশ জানিয়েছেন, এই নিলামের সঙ্গে আয়কর হানার কোনও সম্পর্ক নেই। তিনি কালো টাকা দিয়ে নয়, বৈধ টাকা দিয়েই কিনেছেন। ১.৪১ কোটি দর হাঁকা কোমলকান্ত শর্মার দাবি, তিন বছর আগে যে আয়কর হানা হয়েছিল, তা ছিল টেকনিক্যাল ভুল। পরে তা মিটে যায়। শুধু বিত্তবানেরাই যে নিলামে অংশ নেন তা নয়, অংশ নিয়েছিলেন সুরাটের এক নার্সারি স্কুলশিক্ষক রাজেশ মাহেশ্বরীও। দর দিয়েছিলেন ১.২৫ কোটি টাকা। তবে টাকাটা তাঁর একার নয়, ২৫০ জনের কাছ থেকে ৫০ হাজার করে নিয়ে টাকাটা তুলেছিলেন।

সঙ্ঘ সংবাদ

আমাদের নিয়মিত পরিষেবা তার আপন গতিতে সুষ্ঠুভাবে চলছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে অ্যালোপ্যাথি বিভাগে প্রায় তিন'শ-র ওপরে রোগী সেবা পেয়েছেন। হোমিওপ্যাথি বিভাগটি খুবই সুনামের সঙ্গে কাজ করে চলেছে। গত মাসে প্রায় ৬০০-র বেশি মানুষ এখান থেকে তাঁদের প্রয়োজনীয় পরিষেবা পেয়েছেন। চক্ষু বিভাগটি আজ এই অঞ্চলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে চলেছে। প্রতি সোমবার সকালে এই চক্ষু বিভাগটিতে পঁচিশ থেকে তিরিশজন রোগীকে দেখা হয় অতি সামান্য খরচের বিনিময়ে।

পানীয় জল, ফ্লোরাইড এবং দূষণ-কিছু বক্তব্য

ডঃ দিলীপ কুমার দাস

পূর্ববর্তী লেখার পর

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের Water Quality Recommending Authorities তাদের দেশের পানীয় জলের "ফ্লোরাইড" পরিমানের বিভিন্ন সীমা এবং সেই জল পান করার পর মানব শরীরে তার প্রভাবের ফলে যে সব physiological deformation এবং অন্যান্য সব disorder হয় তার উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষেও সে রকম একটি সংস্থা Bureau of Indian Standards, New Delhi কর্তৃক প্রকাশিত পানীয় জলের ফ্লোরাইডের বিভিন্ন সীমার উল্লেখ আছে (BIS specifications for drinking water, 15 : 10500, 1991)। এই recommendation অনুযায়ী পানীয় জলে ফ্লোরাইডের desirable limit হল 0.6-1.2 mg/litre। যদি জলের অন্য কোন উৎস না থাকে, তাহলে এই সীমা বাড়ানো যেতে পারে 1.5 mg/lit পর্য্যন্ত। World Health Organisation (WHO) পানীয় জলে ফ্লোরাইডের সহনশীলতার মাত্রা 1.5 mg/lit স্থির করেছে। পানীয় জলে ফ্লোরাইডের মাত্রা বিভিন্ন অনুমোদিত পদ্ধতি দ্বারা নির্ণয় করার পর, সেটা BIS-এ প্রকাশিত guideline-এর সাথে তুলনা করলেই সেই জল পানীয় জল হিসাবে গন্য করা যাবে কিনা, তার বিচার করা হয়। তবে এখানে একটি কথা বলে রাখা ভাল, যে সমস্ত analytical result প্রকাশিত হয়ে থাকে সেগুলো অনেক ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। তার কারণ অনেক এবং সেই বিষয় আলোচনার scope এখানে নেই। এই গ্রহণযোগ্যতা কেবলমাত্র ফ্লোরাইডের ক্ষেত্রেই নয়, এটা জলের বেশীরভাগ analytyical result-এর ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা গেছে। যদি সরবরাহ পানীয় জলে (municipality, PHE, sub-surface আর deep well water ইত্যাদির ক্ষেত্রে) ফ্লোরাইডের পরিমাণ recommended limit-এর অপেক্ষা বেশী হয় বা কাছাকাছি কম ফ্লোরাইড যুক্ত জলের উৎস না থাকে, তখন alternative ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বিভিন্ন কার্যকারী defluoridation technique ব্যবহার করে সরবরাহ জলের ফ্লোরাইডের মাত্রা safe optimum limit-এ মধ্যে এনে, তারপর এই জলকে সরবরাহ করা হয় জনসাধারনের ব্যবহারের জন্য। এই পরিষেবার দায়ীত্ব কেবলমাত্র প্রশাসনের। তবে নাগরিকদেরও এ বিষয় নজরদারির প্রয়োজন আছে।

আমি আমার শ্রীভূমির apartment-এর deep tube well (>300m) থেকে সরবরাহ জলের প্রায় সমস্ত প্রযোজনীয় chemical parameters-এর analysis কলকাতার একটি প্রখ্যাত ল্যাববেটোরি থেকে করিয়েছিলাম। দেখা গেছে যে আমরা যে জলটি পান করছি তার সমস্ত chemical parameter, BIS অনুমোদিত সমস্ত limit-এর মধ্যেই আছে। আশা করতে পারি এই অঞ্চলের ঐ গভীরতার deep well গুলির জলে ফ্লোরাইডের মাত্রা safe limit-এর মধ্যেই আছে।

এই অঞ্চলের নাগরিকরা পানীয় জলের জন্য যে জল ব্যবহার করে তা প্রধানত চার ভাবে আসে: (১) নিজস্ব apartment-এর drill করা deep well; (২) অন্যান্য municipality থেকে সরবরাহ করা treated water যা নীল রঙের ২০ লিটারের jar-এ collection করে বাড়ীতে বাড়ীতে vender-এর কাছ থেকে কেনা হয়; (৩) বাড়ীতে বা ফ্ল্যাটে লাগানো ছোট ছোট তথাকথিত জল পরিশ্রুত করার compact machine (water purifier); এবং (৪) local municipality-র প্রতিদিন ১/২ ঘন্টা করে ২-৩ বার সরবরাহ treated water। প্রত্যেকটি সরবরাহ ব্যাবস্থার কম-বেশী ভাল ও খারাপ দিক আছে। এই সম্বন্ধে আমার নিজস্ব observation এবং মতামত সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

প্রথমটির কার্যকারিতা আপাতত অনেকটাই বিপদমুক্ত যদি ফ্লোরাইডের মাত্রা recommended limit-এর মধ্যে থাকে। তবে অন্য tube well-এর জলের রসায়নিক চরিত্র আমার জানা নেই। তাছাড়া জনতা এত বেশী জলে high arsenic-এর মাত্রা নিয়ে চিন্তিত যে তারা এই মৌলটির ব্যাপারে প্রায় একদম চিন্তা করে না। তবে এই অঞ্চলের এই গভীরতার ভূস্তরের চরিত্র এমন যে এই মৌলটির বেশী মাত্রায় থাকার সম্ভাবনা কম যদি না সরবরাহ জল কোথাও কোন ভাবে contaminate হয়ে থাকে। অন্য দিক হল যে tube well-গুলি মাঝে মাঝে অন্তত বৎসরে একবার নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে wash করা উচিত এবং overhead tank-টি মাসে দু-একবার পটাসিয়াস পারমাঙ্গানেট বা ব্লিচিং পাউডার দিয়ে সঠিক ভাবে পরিষ্কার করা। এ ছাড়া tank-এর ঢাকনাটি যেন ভাল ভাবে বন্ধ করা থাকে যাতে কোন বাহিরের অবাঞ্ছিত পর্দাথ ঐ খোলা ঢাকনার মধ্যে দিয়ে water tank-এ না পড়ে। তবে মনে হয়ে tank-এর এই জল সরাসরি কেউ পান করে না। হয় বিভিন্ন water purifier অথবা candle filter দিয়ে ঐ জল পাশ করে তারপর পান করে।

দ্বিতীয়টির কার্যকারিতার ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ থাকে। বড় বড় plastic container-এ অন্য জায়গার treated water collection করে যে জল ঘরে ঘরে supply করা হয়, তা বাহিরের থেকে জল ভরার আগে ভলোভাবে পরিষ্কার করা বা ভর্তি করার জল দিয়ে প্রথমে ভালোভাবে ধোয়া হয় কিনা তা জানা নেই। আবার এক container থেকে অন্য container-এ জল ঢালার সময় বা syphone প্রক্রিয়াতে যেভাবে জল transfer করা হয় তা দূষণমুক্ত কিনা, একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। এই জলের original গুণগত মান chemically ভাল, সুস্বাদু এবং ভাল মানের যেহেতু treated water, কিন্তু bactereologically unsafe হতে পারে কারণ বিভিন্ন ভাবে ও অবৈজ্ঞানিক ভাবে collection ও বহুবার handling করা হয় বলে এই ভয় আমরা এড়াতে পারি না। আবার এই জলের সাথে কিছু পরিমাণ untreated water-ও মেশানো হয় কিনা তাও জানা নেই। তবুও কোন উপায় না থাকার জন্য আমাদের কিনতেই হয় এবং তাই অনেকক্ষেত্রে এই জল পান করার ফলে নানান প্রকার bacteria সংক্রান্ত অসুখের আশঙ্কা থেকে যায়।

তৃতীয়টির কার্যকারিতা বহুলাংশে সন্দেহজনক আমার কাছে। কারণ অনেক বাড়ীতে বা flat-এ (যারা plastic container-এ supplied water পান করে না) বিভিন্ন কম্পানির নানান পদ্ধতি অনুসরণ করা তথাকথিত water purifier যন্ত্র ব্যবহার করে। কিন্তু তার প্রকৃত কার্যকারিতার কোন প্রমাণ আমরা কেউ practically জানি না বা demonstration করে দেখানোও হয় না। সাধারণত এই মেশিনগুলি বিভিন্ন technique-এ কাজ করে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল "Ultraviolet light treatment", "Ozone treatment", "Reverse Osmosis", ইত্যাদি। কোন কোন unit-এ ঐ তিনটির যে কোন একটি, বা অন্য unit-গুলিতে দুটি বা তিনটিই একসাথে ব্যবহার করা হয় অপরিশ্রুত জলকে বিশুদ্ধ করার জন্য। কম্পানিগুলি দাবি করে যে এই পদ্ধতি সমস্ত toxic বা heavy metals সম্পূর্ণ ভাবে remove করে, hard water-কে soft water করে এবং প্রায় সব রোগের bacteria-গুলিকে সম্পূর্ণরূপে মেরে ফেলে। তবে unit-এর বাহিরে আলাদা ভাবে একটি বা দুটি iron remove করার candle থাকে, সেটা iron অনেকটাই আটকে দেয়। কিন্তু ফ্লোরাইড, আর্সেনিক, ক্রোমিয়াম, ক্যাডমিয়াম, মারকারি, ইত্যাদি remove করে কিনা (ওরা দাবি করা যে ধাতুগুলি সম্পূর্ণ ভাবে system-এ আটকে থাকে) সে বিষয় আমার গভীরভাবে সন্দেহ আছে। কেন না তাদের দাবি পরখ করার জন্য সাধারন নাগরিকের কাছে ঐ ধাতু যুক্ত অপরিশ্রুত জল (raw water) নেই। আবার ঐ raw water-কে ঐ technique-যুক্ত machine দ্বারা treatment করার পর, জলে ঐ ধাতুগুলি আছে কিনা, তা মাপার জন্য কোন sophisticated instrument-ও নেই। তবে machine-এ একটি কিংবা দুটি charcoal block-এর candle থাকে ,যার ভিতর দিয়ে অপরিশ্রুত জল pass করানো হয়। তাই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে সম্পূর্ণ না হলেও অন্তত কিছুটা absorb হয়ে candle-এর মধ্যে আটকে থাকে কারণ charcoal block-এর বিভিন্ন ধাতু absorbing capacity বেশ ভাল। তবে অন্যান্য unit-গুলিতে charcoal ছাড়া কি কি absorbing candle থাকে তা আমার জানা নেই। আবার এই সমস্ত technique-গুলোর যে ফ্লোরাইড আয়ন completely বা partially অপসারন করার ক্ষমতা আছে তার নির্দিষ্ট কোন authentic experimental evidence দিয়ে কোন literature এখনও চোখে পরেনি বা service technician-ও এই সংক্রান্ত নানা তথ্যের satisfactory উত্তর দিতে পারেনি। এটাও জানা যায় না যে লাগানো candle-গুলো জলের মধ্যে দ্রবীভূত ধাতুগুলো কতটা absorb করে রাখে। যদি totally remove করে থাকে, তাহলে সেই জলও শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক। ওদের R & D team-এর কাছে এর উত্তর থাকতে পারে। তবে এটা বুঝতে একটু দোটানা হয় যে অপরিশ্রুত জলের সাথে ঐ in-built system-এর যা contact time, তা কি জলের মধ্যে থাকা সমস্তরকম bacteria মারতে বা অন্যান্য candle-গুলি কি বিভিন্ন TDS-যুক্ত জল থেকে ঐ সমস্ত বিষাক্ত মৌল পর্দাথগুলি আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে remove করতে পারে? ঐ একই প্রশ্ন RO পদ্ধতির কাযকারিতার ক্ষেত্রেও। UV আলোর bacteria মারার ক্ষমতা আছে। কিন্তু অপরিশ্রুত জলের সাথে machine-এর মধ্যে যে in-built UV-র উৎস আছে তার contact time মাত্র fraction of a second। তাই বিশ্বাস করা একটু শক্ত হয়ে দাড়ায়। তবুও আমরা কিনি এবং ব্যবহার করি এই বিশ্বাসে যে অপরিশ্রুত জল সম্পূর্ণভাবে না হলেও কিয়দংশ পরিশ্রুত হয়। একমাত্র ফোটানো জলই bacteriologically safe water। কিন্তু ফোটানো জল পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করলে, মানব শরীর তার প্রয়োজনীয় খনিজ পর্দাথ থেকে অনেকাংশে বঞ্চিত হয়। বাজারে বিক্রিত সমস্ত water purifier-গুলি যে সব বিভিন্ন techniques ব্যবহার করে বলে দাবি করে, তাদের প্রত্যেকের কার্যকারিতা সর্ম্পকে পরের কোন সংখ্যায় বিশদভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

চতুর্থটির কার্যকারিতা, অর্থাৎ এই সমস্ত অঞ্চলে municipality দিনে তিনবার থেকে চারবার কম সময়ের জন্য পলতা থেকে treated water supply করে, তা পান করার পক্ষে ভালো, কিন্তু ঐ জলের রসায়নিক চরিত্রের গুনাগন না জানার ফলে, প্রধানত ফ্লোরাইড আয়নের পরিমাণ এবং তার প্রভাব সম্বন্ধে কিছু বলা যাবে না। তবে municipality যে treated water সরবরাহ করে সেই জল সাধারণতঃ chemically safe। কিন্তু যে সমস্ত bacteria ঘটিত casualty মাঝে মাঝে reported হয়, সেগুলি জলের distribution system-এর নজরদারির অভাবে হয়ে থাকে কেননা একমাত্র অপরিশ্রুত জলের সংস্পর্শে এলেই এই জল দূষিত হয়। তাই একমাত্র তীক্ষ্ম নজরদারিই এই সমস্ত ঘটনা থেকে নাগরিকদের রক্ষা করতে পারে।

ভারতের যে সব অঞ্চলে অধিকমাত্রায় ফ্লোরাইড যুক্ত জল পানের জন্য ব্যবহার করা হয় এবং সেখানে যদি অন্য কোন কম মাত্রার ফ্লোরাইড যুক্ত পানীয় জলের উৎস না থাকে, তাহলে সেই অঞ্চলে সার্বিকভাবে defluoridation technique (যেমন বহুদিন যাবৎ "Nalgonda Technique" ব্যবহার করা হত) ব্যবহার করে অধিক মাত্রার ফ্লোরাইড-যুক্ত পানীয় জলকে guidelines অনুযায়ী optimum limit-এর মধ্যে রেখে ব্যবহারের জন্য সরবরাহ করা হয়। ঐ পদ্ধতির অনেক drawbacks আছে। Central Pollution Control Board, Nagpur দ্বারা modified techniques এখন ব্যবহার করা হয়। পানীয় জলের দূষণের কাজে আমার ওতঃপ্রতভাবে জড়িত থাকার ফলে জানি যে বহু প্রত্যন্ত অঞ্চলের পানীয় জলের চরিত্র এখনও ঠিক কি তা জানা যায়নি। এই কাজটা প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতার মধ্যে থাকা উচিত।

পরবর্তী সংখ্যায় শেষ

কেন হবেই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি

নীতিশ মুখার্জি

প্রতি বছরই নিয়ম করে দেশের অর্থনীতির কেন্দ্রীয় ভারসাম্য ‘রেল বাজেট’ ঘোষণা হয়। তার পর পরই দেশের মূল বাজেট। কী জানি কী কারণে সারা দেশ বিপুল উত্তেজনায় মূল বাজেটের দিকে চেয়ে থাকে। মধ্যবিত্ত সমাজের জিজ্ঞাসা থাকে দুটো। প্রথম, আয়করের ওপর করছাড় বাড়ল কি না। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন থাকে পরোক্ষ করের দৌরাত্ম্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়তে চলেছে কি না। কিছু বছর আটকে থাকা রেলে যাত্রী ভাড়া এবারের কেন্দ্রীয় সরকার বাজেটের আগেই যথাসম্ভব বাড়িয়ে দিয়েছিল। আর বাজেট-এর পর বাড়ল পণ্যমাসুল। যাত্রী সুরক্ষা, যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য -- সে তো আপেক্ষিক। এক পণ্যমাসুলের ধাক্কাতেই হু হু করে দাম বেড়ে যাবে সুজলাং সুফলাং শস্য শ্যামলাং দেশে সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যেরই। কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খরা, বন্যা ইত্যাদির কারণে আগামী দিনে দাম বৃদ্ধি ঘটবে এমনটা অতি সরলিকরণ।

নিত্যপ্রয়োজনীয় আনাজপাতির মূল্যবৃদ্ধি কেন ঘটবেই!

নিশ্চিতভাবেই এ ব্যাপারে দায়ী সরকারি নীতি। একদিকে যেমন কৃষিজমির ব্যাপক রূপান্তর ও কৃষি-খাদ্যনীতির পরিবর্তন এবং অন্যদিকে বাজার ও উৎপাদন ব্যবস্থাটাই নির্বিচারে একচেটিয়া পুঁজির হাতে সঁপে দেওয়া, বিশেষত রপ্তানিমূলক বাণিজ্যনীতি গ্রহণ করার ফলে এই মূল্যবৃদ্ধি ঊর্ধ্বগামী হবেই।

ইদানিংকালে দেশের বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীরা মানে টাটা, মিত্তাল, আম্বানিরা ঢুকে পড়েছে কৃষিপণ্য কেনাবেচার বাজারে। এদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা আছে বিদেশী রাঘববোয়াল বহুজাতিক কোম্পানিগুলির। এরা যাতে সরাসরি কৃষ্যপণ্য সংগ্রহ করতে পারে, আইনি বৈধতা মতে, সেইভাবেই এগ্রিকালচার প্রডিউস মার্কেটিং কমিটির (এ পি এম সি) আইন উপযুক্তভাবে বদলে দেওয়া হয়েছে ওদের পক্ষে। তুলে দেওয়া হয়েছে পাইকারি কৃষিবাণিজ্যে অংশগ্রহণ করার ওপর বিধিনিষেধ। ফলে, ফসল উঠবার আগেই বেচাকেনা হয়ে যাবে। কাগজেকলমে সেই ফসল ঢুকে যাবে একচেটিয়া কারবারিদের গুদামঘরে। এরপর সুযোগ বুঝে হবে কালোবাজারি, ফাটকাবাজি। অভ্যন্তরীণ বাজারে একচেটিয়া কারবারিদের আধিপত্য যত বাড়বে, মজুতদারিও তত বাড়বে, মূল্যবৃদ্ধি হতেই থাকবে। কারণ, আইন বদলে মজুতদারির সরকারি বৈধতা দিয়ে দিয়েছে সরকার। ধরা যাক,

দোকান পিছু চাল কতটা মজুত করা যাবে সরকার তার মাত্রা ঠিক করে দিল। ছোট দোকানদার মাত্রানুযায়ীই মজুত করবে। ধরে নিলাম ১ কুইন্টাল, কারণ তার দোকান একটাই। কিন্তু রিলায়েন্স, মেট্রো ক্যাশ অ্যান্ড ক্যারি ইত্যাদিরা তাদের একশ দোকানে করবে একশগুণ। ওয়াকিবহাল মহল জানেন, কিভাবে এর ফলে আলু, তেল, চিনি এমনকি সবজিরও দাম বাড়ছে। কৃত্রিম চাহিদা তৈরি করে একদিকে দাম বাড়াচ্ছে আর অন্যদিকে প্রতিযোগিতা কমাচ্ছে। নিট ফল -- মূল্যবৃদ্ধি।

রপ্তানিমূলক বাণিজ্যনীতি

রপ্তানিমূলক বাণিজ্যনীতির ফলে রপ্তানি ক্রমবৃদ্ধিপ্রাপ্ত। যা, মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম কারণ। বেশিরভাগ পণ্যই যদি রপ্তানি হয়ে যায়, তাহলে অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা বাড়বেই -- ফলে মূল্যবৃদ্ধি অনিবার্য। সামগ্রিকভাবে বাণিজ্যিক ফসলচাষের নীতি নিয়েছে ভারত সরকার। ফলে, খাদ্য ও দানা শস্য আমদানি করতে হচ্ছে। আর ভারতের মত বৃহৎ দেশ যখন বিপুল পরিমাণে খাদ্যপণ্য আমদানি করে তখন আন্তর্জাতিক বাজারেও দাম বেড়ে যায়। তার সঙ্গে যুক্ত হয় আন্তর্জাতিক ফাটকাবাজদের কারসাজি। এর সঙ্গে আছে বিশ্বজোড়া খাদ্যসঙ্কট, অর্থনৈতিক সঙ্কট ও পরিবেশের সঙ্কট। আগামী দিনে সব মিলিয়ে দাম গগনচুম্বি হবেই!

বাণিজ্যিক ফসলচাষ

বাণিজ্যিক ফসলচাষের নীতির ফলে খাদ্যশস্য চাষের বদলে চাষ হচ্ছে গমের জায়গায় তুলো, ডালের পরিবর্তে টম্যাটো প্রভৃতি। ধানচাষের বদলে হচ্ছে উচ্চবিত্তের ফসল লেটুস, বেবিকর্ন, প্যাপরিকা বা ঘর সাজানোর নানা বাহারি ফুল। সর্বোপরি পশুখাদ্যের প্রয়োজনের শস্য। ‘এমএনসি’ কোম্পানিগুলির এখন অন্যতম সোর্সিং হাব ভারত। বিশ্বায়নের দাপটে এদেশের এক শ্রেণীর মানুষের উইক এন্ডে লাগছে ম্যাকডোনাল্ডের বিফ, হ্যাম বা চিকেন বার্গার, ডমিনোজ অথবা পিৎজাহাটের মোজ্জারেল্লা চোবানো পিৎজা। পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, এই মাংসের যোগান দিতে কত পরিমাণ খাদ্যশস্য লাগে? গড়পরতা এক কেজি মুর্গির মাংস তৈরি করতে লাগে ২ কেজি খাদ্যশস্য, শুয়োরের ক্ষেত্রে তা ৩ কেজি আর গোমাংসের ক্ষেত্রে ৭ কেজি। এক কেজি গোমাংস থেকে আহরিত হয় ২২৬ গ্রাম প্রোটিন আর ১,১৪০ ক্যালোরি শক্তি। আর এর জন্য যে পরিমাণ খাদ্যশস্য লাগে তা থেকে সরাসরি আহরিত হতে পারে ৭০০ গ্রাম প্রোটিন আর ২৪,১৫০ ক্যালোরি শক্তি।

তাই জমিতে রিয়েল এস্টেটের পাশাপাশি গজিয়ে উঠছে পশুখামার, পশু খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্র। যে জমিতে হত সোনার ধান, পারিবারিক চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত যেত স্থানীয় বাজারে -- সেই স্বনির্ভর অর্থনীতি প্রায় ভেঙে পড়েছে। কৃষি রূপান্তরিত হচ্ছে কৃষিবাণিজ্যে। ঝাঁ চকচকে শপিংমলের খরচা, টাটকা সবজি বাজারে আসার চাইতে ঠাণ্ডা ঘরে রেখে বিক্রির খরচ নিঃসন্দেহে বেশি। তাই জ্বালানি তেলের উপর্যুপরি দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে খাবারের দাম। এরপর এসে দাঁড়ালো পণ্যমাসুল বৃদ্ধি! ফলত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আবারও বাড়লো বলে!

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

‘গান্ধী সেবা সদন হাসপাতাল’ গড়ে তুলতে
যে সহৃদয় ব্যাক্তিরা আর্থিক সাহায্য করেছেন।
তাদের কাছে আমরা একান্তই কৃতজ্ঞ।

১। ডঃ হিরন্ময় সাহা	৫০,০০০ টাকা।
২। শ্রীমতী পূর্নিমা সিংহ	৩০,০০০ টাকা।
৩। প্রদীপ বর্মন	২০,০০০ টাকা
৪। শ্রীমতী স্বপ্না সাহা	১০,০০০ টাকা
৫। শ্রী সুদাম দাস	১০,০০০ টাকা
৬। শ্রী উৎপল ঘোষ	১০,০০০ টাকা
৭। শ্রীমতী তপতী চৌধুরি	১০,০০০ টাকা
৮। শ্রী অরিন্দম পাল	৫,০০০ টাকা
৯। শ্রী শম্ভুনাথ মুখার্জি	৫,০০০ টাকা
১০। শ্রী গিরিজানাথ নাগচৌধুরি	৫,০০০ টাকা
১১। ডঃ দিলীপকুমার দাস	৫,০০০ টাকা
১২। শ্রী কল্যাণ দত্তচৌধুরি	৫,০০০ টাকা
১৩। শ্রীমতী শুক্লা দাস	৫,০০০ টাকা
১৪। শ্রী কে সি বসাক	৩,০০০ টাকা
১৫। শ্রী সন্দীপ মুখার্জি	৫,০০০ টাকা
১৬। শ্রীমতী সুদিপ্তা ঘোষ	৫,০০০ টাকা
১৭। শ্রীমতী শেফালী সাহা	৫,০০০ টাকা

আলোর দিশারী আমাদের লাইব্রেরি

১ পাতার পর

স্থায়ী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

সারা ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার ব্যাবস্থাকে উন্নত ও জনপ্রিয় করার লক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের অধিনস্ত রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগারের গৃহনির্মাণ, পুস্তক ক্রয়, আসবাবপত্র ক্রয়, আলোচনাসভা সংগঠিত করা ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ অর্থ সাহায্য করে। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার দপ্তর প্রত্যেক বছর বেশ কিছু লাইব্রেরিকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করে।

যে ক'জন স্বেচ্ছাসেবক এই গান্ধী সেবা সঙ্ঘ লাইব্রেরিতে শ্রমদান করে এই গ্রন্থাগারের প্রাত্যহিক কাজ বজায় রাখছেন, তাঁদের ভূমিকা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক। গ্রন্থাগারের সব কাজ কম্পিউটারের মাধ্যমে করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। এই গ্রন্থাগারটি সপ্তাহে সাত দিনই খোলা থাকে। এই গ্রন্থাগারের উন্নতি কল্পে RRRLF, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, গ্রন্থাগার বিভাগ, দক্ষিণ দমদম পৌরসভা প্রমুখ থেকে বিশেষ আর্থিক সহায়তা পেয়ে থাকে।

এই গ্রন্থাগারটির পরিষেবা আরও সাধারণ মানুষ তথা আর্থিক দিক দিয়ে অনগ্রসর মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিলে আশা করা যায় গ্রন্থাগারটি পূর্ণ সফলতা পাবে। লাইব্রেরিতে ছোটদের গল্প বলা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, বিশেষ দিবস পালন, পাঠচক্র সংগঠিত ইত্যাদি নানান ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আরও উন্নতি করা যেতে পারে। আমার ৩৩ বছরের গ্রন্থাগারের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতায় এটিকে একটি সফল গ্রন্থাগার বলে মনে হয়েছে। মানুষে মানুষে যে শ্রেণী বিভেদ তা একমাত্র শিক্ষাই মুছে ফেলতে পারে। আর স্বাধীন শিক্ষা গ্রহণের একমাত্র স্থান গ্রন্থাগার। কবির ভাষায় এক পথ শিশু বলে ওঠে --

তাই তো আমি পড়ছি বসে
পথ কুড়োনো বই
তোমার সাথে আজকে না হোক
কালতো খেলবোই।

ঐ পথশিশুকে গ্রন্থাগারের পথ চেনানো আমাদের প্রথম কাজ।

এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন...

প্রতিভা সরকার

আরেক কন্যে কি শুধু খান? -- না, তিনি খাবার জিনিস যোগান কেবল। এমন জিনিস যেগুলো কেটেকুটে রান্নার উপযোগী করে নেওয়া দস্তুর মতো শিল্প। অথচ রান্নার পর সেই কঠিন কাটাকুটির বস্তুগুলি হয়ে ওঠে যেন অমৃত! যেমন থোড়, মোচা, ডুমুর, এঁচোড়। সাধারণ বাঙালি গেরস্থালি থেকে এরা হারিয়ে যেতে বসেছে, কারণ এখন কোন গৃহিনীই আর এদের পেছনে অনেকটা সময় অপব্যয় করতে রাজি নন। অথচ খেতে তো দারুণ এসব দিয়ে তৈরী সব পদ! যেসব গিন্নীমায়েরা এই দোটানায় পড়ে কষ্ট পান তাদের জন্য সল্টলেকে আছেন ব্রজ প্রামাণিক --- আমার কাছে এবারের নারীদিবসের দুই মুখের একজন।

করুণাময়ী হাউসিং-এর যে দেওয়ালটা আনন্দলোক হাসপাতাল আর জি এস আই অফিসের উল্টোদিকে পাশে পাশে চলতে থাকে, সেটা ধরে দশ নম্বর ট্যাঙ্কের দিকে গেলেই রোজ সকালে ব্রজের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। টালি বসানো ফুটপাথে বাস স্টপের পাশে সে বসে থাকে, সামনে তার ছোট্ট পশরা। আশপাশে অনেক বড় বড় সব্জির দোকান। মাঝখানে নীরক্ত ব্রজ নিপুণ হাতে কেটে চলে কখনো ডুমুর, কখনো এঁচোড়। রোগা মেয়েটাকে সালোয়ার-কামিজ ছাড়া শাড়ি পরতে দেখিনি কখনো। তার কারণ বোধহয় ওর পেছনে দাঁড় করানো সাইকেলটা। সেটাই ব্রজের বাহন, ওকে নিয়ে আসে কেষ্টপুরের কোন ঘুপচি ঘর থেকে। হয় অ্যানিমিয়া, নয় তো অন্য কোন অসুখে ব্রজর চোখমুখ ফুলো ফুলো, অথচ শরীরটা ভারী রোগা। কিন্তু ওর পেছনে জলজ্যান্ত রসিকতার মত জেগে থাকে সৌন্দর্য্যায়নের ফসল দেওয়ালে খোদিতো একটা লেখা, 'সুস্থ শরীর সমাজের সম্পদ।' সামনে বসে ব্রজ নিজেকে সান্ত্বনা দেবার মত করেই আমাকে বলতে থাকে, "দিনে দু-একশ টাকা হয়েই যায়। বসে থাকার থেকে ভাল, বলো বউদি। তুমিও তো কখনো আমার কাছ থেকে নাওনা কিছু, কাঁটাতেও তো পারো এঁচোড়-টেঁচোড়।" তাকে বলে ওঠা হয়না, আমি তখন যাচ্ছি কাজের জায়গায়। আমার ফেরবার সময় বেলা দুটো। ততক্ষণে ব্রজ ফুরুৎ। তাই বাস আসবার আগে শুধু দু-চারটে কথা। কিনি না কিছুই, তবু অসমমনস্ক আর বিপরীত সামাজিক অবস্থানের দুই নারীর মধ্যে কি করে যেন গাঢ় সখ্যের উষ্ণতা গড়ে উঠতে থাকে একটু একটু করে!

ধরা যাক একটা ছুটির দিনে ব্রজ প্রামাণিকের সামনেটা খালি করে সব কঠিন-কাটা সব্জি নিয়ে গেলেন কোনও গিন্নিমা। কিন্তু অতক্ষণ ধরে রাঁধবে কে? কেন, ঝুমা মিরধার মতো মেয়েরা? ঝুমা এসেছে পূর্ব মেদিনিপুরের বামিয়াজঙ্গল নামের গ্রাম থেকে। আমার কাছে সে এবারের নারী দিবসের আর এক মুখ। সবাইকে ছেড়ে তার এখানে পড়ে থাকতে মোটেই ভাল লাগে না, মনে পড়ে বিশাল মাঠে সমবয়সীদের সঙ্গে ছুটোছুটি, কাদা পুকুরে যত না স্নান তার থেকে পাঁক ছোঁড়াছুড়ি। সাদা ঝকঝকে দাঁত বার করে হাসে ঝুমা, "জান কাকিমা, আগে আরও কালো ছিলাম। এখানে এসে মাইনের টাকা থেকে ফার অ্যান্ড লভলি (ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি) কিনে মেখে মেখে অনেক ফর্সা হয়েছি।"

বুঝতে পারি গাত্র বর্ণের কারণে আরও অনেক বাঙালি মেয়ের মতো একেও নিগৃহীত হতে হয়েছে। টাকা জমিয়েই বিয়ের পিঁড়িতে বসে যাবে এরকম চিন্তায় আকুল নয় ঝুমা। অনেক দেখেছে সে এই আঠারো-উনিশে। বরং বড় ভাইঝিকে স্কুলের পাঠ শেষ করাবে এই তার প্রতিজ্ঞা। অর্থাভাবে তার নিজের যা হয়নি, ভাইঝিটির তা হোক, তারপর দেখা যাবে।

৮ই মার্চ নারীদিবসে কত পাতাজোড়া বিজ্ঞাপন খবরের কাগজে। বিশেষ করে বড় বড় অলঙ্কার-বিপণীগুলির। কেউ নারীসুরক্ষা সম্মান ঘোষণা করলে, অন্য একজন দেবে নারী-উৎকর্ষ সম্মান। কোনও বিখ্যাতা পাবেন হয়ত লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড। সেগুলো দেওয়া একশবার উচিত। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁদের বিশেষ অবদান, তাঁদের সম্মানপ্রাপ্তি আমাদের খুশি করবে বৈকি। কিন্তু যে কন্যেদের দেখা মেলে হামেশাই জীবনের নানান বাঁকে, যারা শুধু বেঁচে থাকবার জন্য রোজ মাথার ঘাম ঝরায় অনবরত, তাদের কোনও স্বীকৃতি দিতে আমরা এত কুণ্ঠিত কেন? ব্রজের লজঝরে সাইকেলটার বদলে যদি তাকে দেওয়া যেত একটা নতুন বাহন, আমি নিশ্চিত জানি, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পরীর মত অনায়াসে বাতাস কেটে সে সাঁইসাঁই ছুটে আসত কোন ভোরে। ফুটপাতের নির্দিষ্ট জায়গাটা বেহাত হয়ে যাওয়ার ভয় থেকে মুক্তি পেয়ে রাতের ঘুমটা গাঢ়তর হোত তার। ঝুমার প্রার্থনা একটি মোবাইলের, যাতে দিনের মধ্যে যখন খুশি কথা বলা যায় বামিয়াজঙ্গলের জংলি বাতাস আর মাঠঘাটের সঙ্গে। বিশেষ করে সেই দিনগুলোতে যখন শহরের ইঁট আর সিমেন্টে গাঁথা খুপরিগুলো তার নিশ্বাস আটকে দেয় হঠাৎ হঠাৎ-ই।

জানি, এ প্রশ্ন উঠতেই পারে যে, নিজেদের মতো করে জীবন সংগ্রামে তো ব্যস্ত আছি আমরা সবাই-ই। কেই-ই বা দেয় কার স্বীকৃতি! কেনই-বা তবে বেছে বেছে ব্রজ আর ঝুমা? আসলে আমরা যারা নিশ্চিত চাকরি বা আশ্রয়ের নিরাপদ ঘেরাটোপে বাস করি, তাদের দৈনন্দিন জীবনে এই কন্যেদের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সে তো ভালই বোঝা যায় হঠাৎ কাজের দিদি না এলে। তখন আক্ষেপে গাইতে ইচ্ছে করে একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত, 'তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়'। সংসার তরণীর এই আচমকা সলিল সমাধির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ব্রজ অথবা ঝুমা। না হয় হলই বা শুধু নিজের ভালোর কথা মনে করেই, আসুন না আজ ওদের সঙ্গে সহানুভূতির একটু ছোঁয়া মিশিয়ে হেসে একটু কথা বলি। আজ তো ৮ই মার্চ। নারীদিবস।

ছবি ঃ প্রতিভা সরকার

AGNI
AGNI POWER & ELECTRONICS PVT. LTD.
An ISO 9001 :2008 and OHSAS: 18001 : 2007 Certified Company
Leader in Solar PV Engineering
MNRE, Govt. Of India Accreditated Channel Partner
HEAD OFFICE:
114, Rajdanga Gold Park (1st floor), Kolkata-700 107
Tele Fax: (091) (33) 4005-1193/4061-0038
E-mail: Info@agnipower.com/Web: www.agnipower.com

LEARN GUITER
&
KEYBOARD
JOY CHAKRABORTY
Ph: 9830283520
Gandhi Seva Sangha
Sribhumi

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের পক্ষে সুব্রত পাল কর্তৃক ২০৭/১, এস কে দেব রোড, কলকাতা-৪৮ থেকে প্রকাশিত ও প্রিন্ট-ও-গ্রাফ, ৩, বিদ্যাসাগর স্ট্রিট, কলকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত
১ম বর্ষ • ৪র্থ সংখ্যা। সম্পাদক: জবা গুহঠাকুরতা